বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ

কৃষি-প্রতিবেশ গণগবষেণা দল

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ



বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ

বগুড়া-সাতক্ষীরা-নীলফামারী

কৃষি-প্রতিবেশ গণগবেষণা দল

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ

Local Environment-friendly Agricultural Resources in Bangladesh

কৃষি-প্রতিবেশ গণগবেষণা দল

Participatory Action Research Group on Agroecology

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৯

Published in: December, 2019

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 07 (Kajoli), Road 17, Block C,
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de/en/

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.de/en/

মুদ্রণে:
ফেমাস প্রিন্টিং
খ-১১৫/৬, জামতলা, নিকুঞ্জ-২
রোড-১, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

Printed by:
Famous Printing
Kha-115/6, Jamatala, Nikunja-2
Road-1, Khlkhet, Dhaka-1229

ছবি : প্রচ্ছদ
সুরাইয়া বেগম

Picture cover
Suraiya Begum

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং (আরএলএস)-এর সহায়তায় ২০১৭ সাল থেকে কাজ করছে "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ এবং গণগবেষণা" প্রকল্পে। যার বিষয়বস্তু কৃষি, কৃষি-প্রতিবেশ, কৃষক সমাজ, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব, নিরাপদ খাদ্য প্রভৃতি। প্রকল্পের কাজের উদ্দেশ্য এ-সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্বেষণ ও কৃষক সমাজে এর চর্চা করা। রিইব মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে একশন রিসার্চের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। সেই সাথে প্রকাশনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করাও রিইব এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর মালিকানা একটি সামাজিক শক্তি। আজকে বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কৃষক সমাজ শিক্ষা ও প্রযুক্তির যে স্তরে রয়েছে তাতে জ্ঞান সম্পর্ক অনেক বেশি অসম হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং দেশ ও বিশ্ব কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করার প্রথম পদক্ষেপ। রিইব জ্ঞানের এই অসমতা কমিয়ে আনা এবং কৃষকের মাঝে জ্ঞানকে পৌছে দেবার লক্ষ্যে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলায় প্রকাশ করছে এবং সেসব প্রকাশনা গণগবেষণা দলে এবং লোকাল স্কুলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, এর মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করছে।

'কৃষি প্রতিবেশ' বিষয়টি যখন থেকে মানুষ ভূমি কর্ষণ করা শুরু করেছে তখন থেকেই এর শুরু। বৈশ্বিক পরিসরে শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এর এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তি যত বেশি প্রসারিত হয়েছে প্রতিবেশ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে ধরনের প্রতিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষতিগুলো যে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করছে তাকে তুলে ধরা এবং এই সংক্রান্ত জ্ঞান কৃষক ও অন্যদের সাথে বিনিময় করা এসব বই প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

রিইব আরও মনে করে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিভিন্ন সেক্টরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাঁদের কাছেও আমাদের এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে যাতে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে পারে। রিইব তাই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এই সম্মিলিত প্রয়াস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করবে তেমনি জনগণের কাছে নিরাপদ খাদ্য পৌছে দেবার চেষ্টায় জ্ঞান উৎপাদন করবে।

এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে এই ধরিত্রীর প্রতিবেশ সুস্থ্য থাকে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে রিইব এর ক্ষুদ্র প্রয়াস এইসব প্রকাশনা।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব।

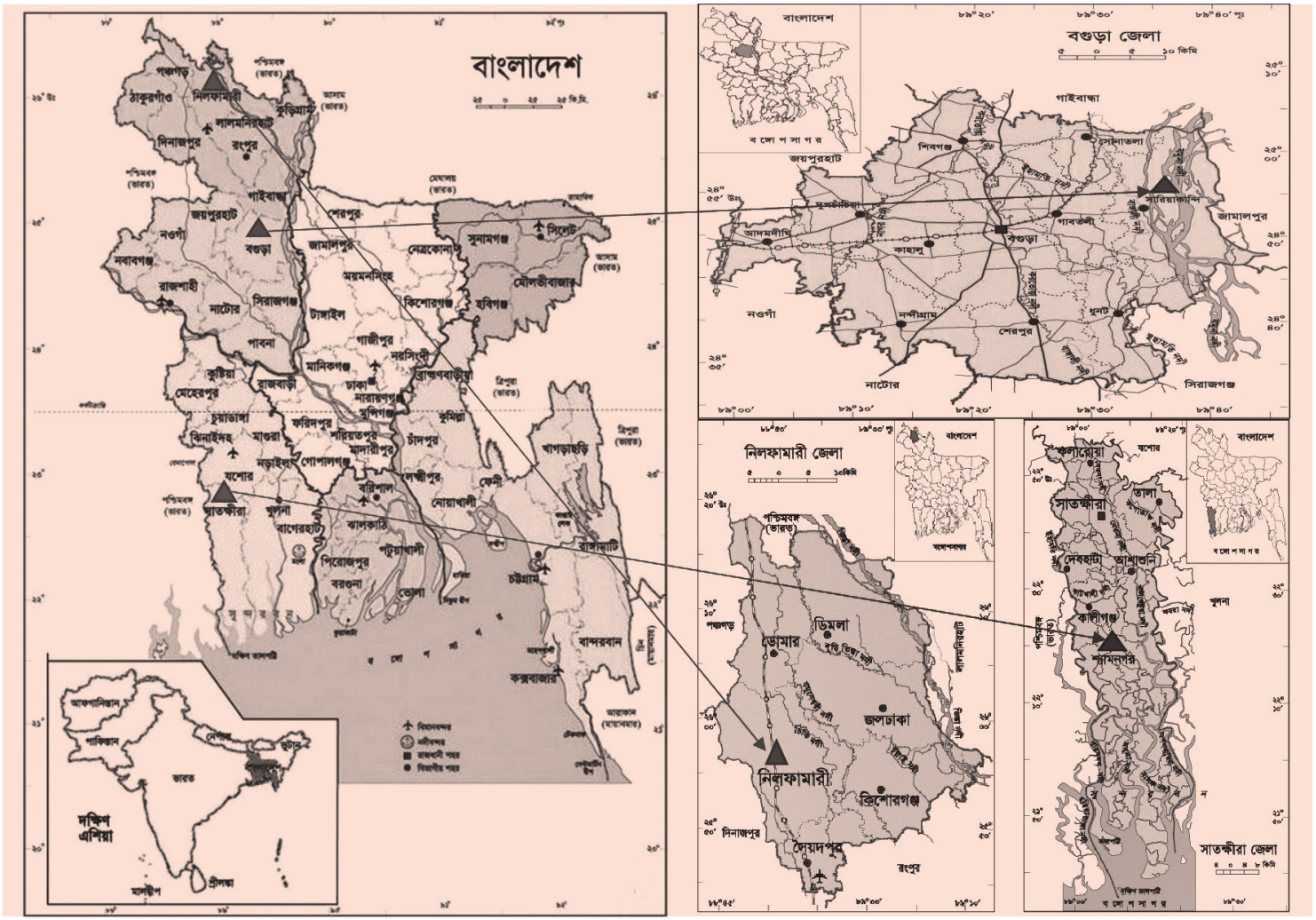
সূচিপত্র

ভূমিকা---------- ৬
প্রকল্প এলাকা ঃ সারিয়াকান্দি উপজেলা, বগুড়া---------- ১৪
প্রকল্প এলাকা ঃ শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা---------- ১৯
প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী সদর উপজেলা, নীলফামারী---------- ২৫
উপসংহার ঃ গ্রামাঞ্চলে কৃষি পরিবেশবান্ধব জ্ঞান সম্পদ---------- ২৯

মানচিত্র ঃ

বাংলাদেশ ও প্রকল্প এলাকার মানচিত্র---------- ৫
সারিয়াকান্দি উপজেলা, বগুড়া---------- ১৩
শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা---------- ১৮
নীলফামারী সদর উপজেলা, নীলফামারী---------- ২৪

বাংলাদেশ ও প্রকল্প এলাকার মানচিত্র



ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট বদ্বীপ দেশ বাংলাদেশ। আবহমানকাল থেকে কৃষি এই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি এবং জীবন জীবিকার প্রধান মাধ্যম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। কৃষির উন্নয়নের সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশ স্বাধীনের পরেই খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তাঁর নির্দেশে সংবিধানে কৃষির উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ধারা সংযোজন করা হয়। ফলশ্রুতিতে কৃষি খাতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়।

আমরা দেখেছি যে পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ধারা ঊর্ধ্বমুখী করা হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সবজি উৎপাদনে ৩য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ, আম উৎপাদনে ৭ম এবং আলু উৎপাদনে ৮ম স্থান অর্জন করেছে। ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[১]

নি:সন্দেহে বাংলাদেশ শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শস্য উৎপাদন স্বাধীনতাপূর্ব কালে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বর্তমানে ৩৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দাবী করা হয় মূলত ধান এবং গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে। যা কিনা শ্বেতসার জাতীয় শস্যের প্রধান সরবরাহকারী। যে কারণে ঘাটতি দেখা যায় সবজী, ফলমূল, গবাদী পশু, মাছ এবং পোলট্রি খাদ্যে - এসবই আসে ভূমিভিত্তিক ফার্মের মাধ্যমে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য চাহিদার কারণে শস্য নিবিড়করণের হার ১৯১% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মোট শস্য উৎপাদন এলাকা ১৪.৯৪ মিলিয়ন হেক্টর হয়েছে যা ছিল মূল শস্য এলাকা ৭.৮৪ মিলিয়ন হেক্টর। একই জমিতে একই শস্য বছরের পর বছর ধরে সার, কীটনাশক এবং হাই ইনপুট সহযোগে চাষ করার ফলে হ্রাস পেয়েছে প্রাকৃতিকভাবে উর্বরতা, উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য।

একে সমর্থন করে বাংলাদেশে প্রণীত জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬ -তে বলা হয়েছে যে, "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি, রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশকের ব্যবহারে ফসলের ফলন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার যাতে জনস্বাস্থ্য ও কৃষি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করে সেজন্য সচেতন নাগরিক সমাজের মাঝে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের চাহিদা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে নিরিখে জৈব কৃষি (Organic Agriculture) বর্তমান বিশ্বে এক আলোচিত অধ্যায় ও দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে বিবেচিত।[২]

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা ছিল সাধারণ অর্থে জৈব কৃষির প্রাক-অবস্থা। কালের বিবর্তনে কৃষি-রাসায়নিক ও ভূগর্ভস্থ পানির অতিমাত্রায় ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জৈব কৃষির প্রথম বিকাশ ঘটে বেসরকারি পর্যায়ে এবং '৯০ এর দশকের শুরুতে এর বিস্তৃতি লাভ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ হতে চা ও চিংড়ি প্রত্যায়িত জৈব পণ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।[৩]

জাতীয় জৈব কৃষি নীতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কৃষির জন্য জাতির পিতার (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) আহ্বানে 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতি থেকে বর্তমানে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। এই স্বয়ম্ভরতা অর্জনে কৃষি রাসায়নিকের (Agro-chemicals) ব্যবহার অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে মাটি ও জনস্বাস্থ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরূপ প্রভাব। এ প্রভাব হ্রাসকরণের অন্যতম উপায় জৈব কৃষি; কেননা এটা মাটি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত বিধায় ক্রমান্বয়ে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কৃষি সৃষ্টি করতে পারে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একান্ত কাম্য। ... দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা সনাতন ও দেশজ (Traditional & Indigenous) প্রথা, ধারণা ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা এবং তাদের মূল্যায়ন সাপেক্ষে জৈব ফসল উৎপাদনে সম্পৃক্তকরণকে উৎসাহিত করা হবে।"[৪]

সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবর্তিত জলবায়ু ঝুঁকি বিশেষ করে বজ্রপাত মোকাবিলায় উপযোগী বৃক্ষ চাষ সম্প্রসারণ, পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে জমির যথাযথ ব্যবহার, গ্রামীণ নারীদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ, এবং ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশকে পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসে এবং কৃষি নীতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

দুই

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মূল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে কৃষিকে ভিত্তি করে। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামে বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠী বাস করত এবং তারা টিকে থাকত পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে। সেখানে কামার, কুমোর, জেলে, ঋষি, ডোম, নাপিত এবং কৃষকসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস করত। প্রতিটি গোষ্ঠীর উপযোগিতা ছিল এবং এই উপযোগিতাই প্রতিটি গোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করত। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস ছিল। অন্যদিকে তাদের মধ্যে সহমর্মিতাও ছিল এবং শ্রেণিনির্ভরতাও ছিল। প্রতিটি জনগোষ্ঠী আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনধারণের জ্ঞান ছিল। এই জ্ঞান পরম্পরা অনুসারে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হতো। যে জ্ঞান ছিল একেবারেই স্থানিক, যা একেকটি এলাকার বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতিকে ধারণ করত।

কৃষিক্ষেত্রে প্রথম বড় ধরনের পরিবর্তন আসে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে। ঐতিহ্যগত কৃষি যা ছিল স্থানিক সম্পদ এবং জ্ঞান নির্ভর সেখানে বাইরের সম্পদ এবং জ্ঞানের আগমন ঘটে। একেকটি গ্রাম যেভাবে স্বনির্ভর ছিল তার প্রকৃতি পরিবর্তন হতে থাকে ধীরে ধীরে। নয়া উপনিবেশবাদের কারণে বাংলাদেশের ছোট ছোট গ্রামগুলোও ক্রমশঃ বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বিশ্বায়নের প্রভাব গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে, সেই সাথে সবুজ বিপ্লব



বালাইনাশক হিসেবে নিম পাতার নির্যাস তৈরী করা হচ্ছে

কৃষিতে, কৃষক সমাজে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কৃষিতে জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাষাবাদ বদলে গিয়ে রাসায়নিকের অনুপ্রবেশ ঘটে।

ঐতিহাসিক পরিসরে যদি দেখা যায় তাহলে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের গ্রাম, এর সম্পদ, পরিবেশ এবং জ্ঞানের জগত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। দৃশ্যমান অনুপ্রবেশ ঘটে মোঘলদের আগমনের মাধ্যমে। দীর্ঘ শাসনকালে মোঘল শাসকরা শাসনব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে, যা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে, কৃষক সমাজে, তাদের জীবনযাপনে, পরিবর্তন নিয়ে আসে। তবে মোঘল শাসকরা বহিরাগত হলেও পরবর্তীতে তারা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে নিজের দেশ হিসেবে শাসন কাজ পরিচালনা করেছে।

মোঘল শাসনের শেষের দিকে অনুপ্রবেশ ঘটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। যারা মূলতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে উচ্চাভিলাসী আকাঙ্ক্ষায় ভারতবর্ষকে উপনিবেশে পরিণত করে। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব এখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৭৫০ সালকে প্রাক শিল্প বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লবের বিভাজন রেখা হিসাবে দেখা হয়। অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে ভারতবর্ষ তার সার্বভৌমত্ব হারিয়ে উপনিবেশে পরিণত হয়।

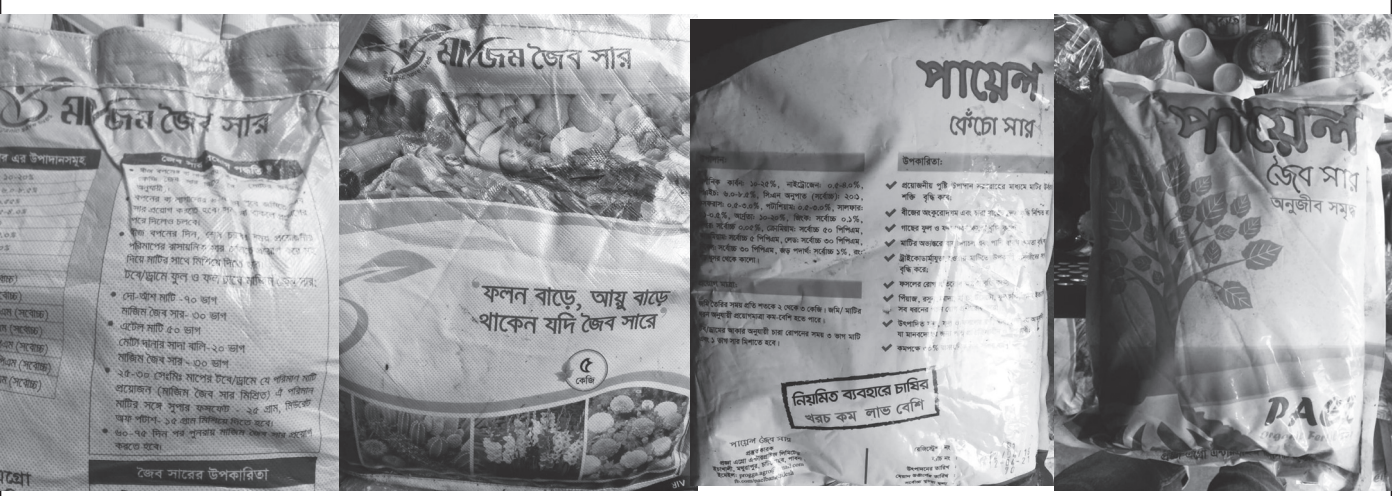
বৃটিশরা কখনই ভারতবর্ষকে নিজস্ব দেশ হিসাবে মনে করেনি। তারা এদেশকে কর আহরণ তথা সম্পদ আহরণের ভূমি হিসাবে দেখেছে। সে কারণে তারা ক্রমাগতভাবে কৃষি নির্ভর এই দেশের সমাজকে নিপীড়ন করেছে। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষক সমাজ। এই সময়েই বলা হয় কৃষক সমাজ থেকে বেরিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। যাদের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি নয় - শিক্ষা। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল শাসক গোষ্ঠীর অনুসারী শ্রেণি। যারা উপনিবেশিক আমলে চাকুরীর মাধ্যমে নীতি প্রণেতা এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। এই শ্রেণিও কৃষক শ্রেণিকে শোষণের মাধ্যমেই নিজেদের ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়েছিল।

পরবর্তীতে ভারত বিভাগের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং বাংলাদেশ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের একটা অংশ হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করলেও প্রকারান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। কেননা

কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। ১৯৪৭-১৯৭১ এই পর্বে গ্রামাঞ্চল বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। যেখানে মূলতঃ কৃষক সমাজই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং শোষিত হয়েছিল। পাট চাষীরা পাট উৎপাদন করত কিন্তু তার মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কোষাগারে, বাংলাদেশের কৃষকদের হাতে নয়। একাত্তরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দেশ স্বাধীন করে।

বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক সমাজ, ভূমিস্বত্ব, কৃষির উৎপাদন পদ্ধতি, রাষ্ট্রের সাথে কৃষির সম্পর্ক– এসব নিয়েই কৃষি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। যা কিনা কৃষির সামগ্রীকতায় প্রভাব রাখে। মার্কসের মতানুসারে শিল্পবিপ্লব উত্তর ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করে অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমর্থকরা দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা ন্যূনতম বলে মনে করে থাকে। এটি অনেকাংশে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার মত কৃষি প্রধান দেশে যেখানে কৃষক সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অর্থনীতির অন্যতম খাত কৃষি সেখানে রাষ্ট্রই প্রধান কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান। আর এই কর্তৃত্ব প্রসারিত হয় কৃষির প্রতিও। কৃষি উৎপাদন উপকরণ, কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আহরণ - এসবই করে রাষ্ট্র। উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশের বাজার, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রাখে দেশের ভেতরকার আমলা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। দেশের অনুৎপাদনশীল উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৈদেশিক ধান এবং বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। এসব ঋণের পরিশোধে রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করে থাকে। অধিকতর উৎপাদনের জন্য কৃষককে উৎসাহিত করা হয়, মুক্তবাজার অর্থনীতির বিভিন্ন লোভনীয় অংশ কৃষকের সামনে তুলে ধরা হয়। আর এভাবেই উন্নয়নশীল দেশের কৃষকরা তাদের পারিবারিক খামার উৎপাদনভিত্তিক খোরাকী অর্থনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়।

সবুজ বিপ্লবের কনসেপ্ট বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই একটি অনুষঙ্গ। সবুজ বিপ্লবের অনুপ্রবেশ কৃষির উৎপাদন কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা থেকে কৃষক রাসায়নিক কৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যা কিনা প্রকৃতিতে ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনেও যার প্রভাব গভীর। বর্তমান বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষি হয়ে পড়েছে বাজারের চাহিদা কেন্দ্রিক। সামাজিক চাহিদা



বেসরকারি কোম্পানীর বাজারজাতকৃত জৈব সার

সেখানে গৌণ হয়ে পড়ছে। যার প্রভাব পড়েছে গ্রামকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্ক এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের উপর। একই সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি থেকে একক ফসল বিশিষ্ট কৃষিতে (মনো কালচার) রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে স্থানীয় কৃষিজ সম্পদ ও জ্ঞান।

অন্যদিকে কৃষি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে অর্থাৎ রাসায়নিক কৃষির বিপরীতে জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির তত্ত্ব সামনে চলে এসেছে। যা ক্রমশঃ বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে এবং বিস্তৃত হচ্ছে। এমনকি যেসব বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা রাসায়নিক কৃষির উপকরণ তৈরি ও বাজারজাত করে, সেইসব সংস্থাই এখন জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং জৈব কৃষির উপকরণ বাজারজাত করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। বাংলাদেশে এসিআই কোম্পানী জৈব সার উৎপাদন করে প্যাকেটজাত করে বিক্রি করছে। সুতরাং বিশ্ব বাজার ব্যবস্থা এখন কোন সরল একরৈখিক রেখায় প্রবাহমান নয়, এর জটিলতা বিভিন্নমুখী। এর রেশ বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যন্ত একটি গ্রামেও প্রভাব রাখছে। এই গবেষণা কাজে দেখা হয়েছে বাংলাদেশের তিনটি প্রত্যন্ত গ্রামে স্থানীয় পরিবেশ বান্ধব কৃষিজ সম্পদ কি আছে। একই সঙ্গে দেখা হয়েছে কিভাবে জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির মতাদর্শ এই সম্পদকে বৃদ্ধি করছে বিভিন্ন জ্ঞানের মাধ্যমে, যে জ্ঞান কৃষককে উদ্বুদ্ধ করছে। এখানে কৃষকরা যে জ্ঞান লাভ করেছে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ করে তিনটি প্রকল্প এলাকায় তারও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই বই-এর শেষ অংশে বিধৃত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, গবেষণার এটি দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশ পরিচালিত হয়েছিল 'বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিজ ও প্রতিবেশগত পরিবর্তনের স্বরূপ' এই শিরোনামে। যেখানে বিভিন্ন কৃষিজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্বে কি অবস্থায় ছিল এবং বর্তমানে কীভাবে আছে তার তুলনামূলক আলোচনা বিধৃত হয়েছে।

গবেষণার এলাকা ছিল বগুড়া, সাতক্ষীরা এবং নীলফামারীর তিনটি উপজেলা যথাক্রমে- সারিয়াকান্দি, শ্যামনগর এবং নীলফামারী সদর উপজেলা। এখানে শুধু গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান সম্পদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন.

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল প্রায় একইরকম হলেও এর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। সেই বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে ৩০টি এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা হিসাবে এরকম তিনটি জেলা বগুড়া, সাতক্ষীরা ও নীলফামারী এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তিনটি জোন হিসাবে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলা, নীলফামারীর সদর উপজেলা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেবার্গ স্টিফটুং এর সহায়তায় ২০১৭ সাল থেকে "প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা" শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই তিনটি উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের নয়টি গ্রামে কাজ করছে রিইব। গ্রামগুলো সাতক্ষীরা জেলার ধুমঘাট, পাতড়াখোলা, বংশীপুর গ্রাম; নীলফামারী জেলার জয়চন্ডি, বেরাকুঠি, সরকারপাড়া গ্রাম এবং বগুড়া জেলার বালুয়ারতাইড়, নয়াপাড়া এবং মাঝবাড়ী গ্রাম। এই নয়টি গ্রামে নারী পুরুষ সহযোগে নয়টি গণগবেষণা দলগঠন করা হয়েছে। এক একটি দলের সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ১৫ জন। রিইব এর কাজের মূল জায়গা হচ্ছে অংশগ্রহণ। অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রিইব এর গবেষণা কার্যক্রমে সরাসরি গবেষক হিসাবে কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দলে নারী - পুরুষ উভয়ই সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গণগবেষণা দলে কৃষকেরা একত্রিত হয়ে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সেসব সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কাজ করতে পদক্ষেপ নেয়। মূলত: একশন রিসার্চের মাধ্যমেই গণগবেষণা দলটি পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

গণগবেষণা দলে কৃষকদের আলোচনায় বারে বারেই ঘুরে ফিরে এসেছে একটি ইস্যু, বাপ-দাদার আমলের কৃষি বনাম আজকের কৃষি অর্থাৎ কৃষির পরিবর্তন। সহজ কথায় জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষি থেকে রাসায়নিক কৃষিতে রূপান্তরণ। বাংলাদেশের জন্মের সময়ে অর্থাৎ ১৯৭১ সালে তাদের গ্রামের কৃষি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কৃষি সংক্রান্ত বিষয় কেমন ছিল আর বর্তমানে কেমন আছে -এর একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। এই পরিবর্তন আসলে তাদের জীবনে, তাদের কাজে, তাদের জীবন জীবিকায় কী ধরনের প্রভাব রেখেছে। এই রূপান্তরণের বিভিন্ন দিকের একটি তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে সকল প্রকল্প এলাকার গণগবেষণা দলের সদস্যরা একত্রে স্থানীয় এলাকার প্রেক্ষাপটে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী করার উদ্যোগ নেয়। কৃষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ"। এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে তিনটি জেলার তিনটি উপজেলায় কৃষিজ সম্পদ এবং জ্ঞান পূর্বে যা ছিল তার তথ্য আহরণ করা হয়েছে। একই সাথে উক্ত এলাকায় বর্তমানে বিভিন্নভাবে যে জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে এবং যার চর্চা কৃষক জনগোষ্ঠী সচেতনভাবে করে যাচ্ছে তার একটা চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।। সময়সীমা ধরা হয়েছে ১৯৭১-২০১৯ পর্যন্ত।

পদ্ধতি

তিনটি প্রকল্প এলাকার নয়টি গ্রুপ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করেছে তাদের সময় সুযোগ অনুযায়ী। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা ছিল না তাদের জন্য। গণগবেষণা দলে আলোচনার মাধ্যমে তারা নিজেরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেছে। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তা তুলে ধরা হলো।

১. তথ্য সংগ্রহের জন্য গণগবেষণা দলের সদস্যরা গ্রামের ভিতরে এবং গ্রামের আশেপাশে থাকেন এমন বয়স্ক নারী পুরুষের সাথে কথা বলেছেন। যাদের স্মৃতিতে ১৯৭১ সাল এবং পূর্ববর্তী সময়ের চাষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল।

২. এইসব বয়স্ক নারী পুরুষেরা তথ্য দিতে আগ্রহী ছিলেন বেশি। তবে তারা জানতে চেয়েছেন যে, এসব তথ্য দিয়ে কি হবে? কৃষকরা উত্তরে বলেছে তথ্যকরণ করা হবে এবং তার প্রকাশনা হবে। এর মাধ্যমে ইতিহাস সংরক্ষণ করা হবে।

৩. সমসাময়িক কৃষকদের সাথেও কথা হয়েছে। তারা বলেছেন যে, তারা পূর্বের জ্ঞানের সাথে আধুনিক জ্ঞানের চর্চা করতে বেশি আগ্রহী।

৪. স্থানিক পর্যায়ের কৃষিজ জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য প্রদানে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি বয়স্ক নারীরাও সহায়তা করেছেন।

৫. তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে ধান কাটার কাজ ছিল। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সন্ধ্যা বা রাতের বেলা তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। গবেষণা সহকারী উল্লিখিত সময়ে উপস্থিত থেকেছেন। লিখিতভাবে ডকুমেন্টেশন করেছেন তিনি, কেননা অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর। যারা লিখতে জানেন, তারাও দ্রুত লিখতে পারেন না। ফলে গবেষণা সহকারীকে সকল তথ্য লিখিতভাবে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

৬. পুরুষের তুলনায় তথ্য দেবার ক্ষেত্রে নারীরা আগ্রহী ছিল বেশি এবং সহযোগিতা করেছে বেশি।

৭. গ্রুপের সদস্যরাও তথ্য প্রদান করেছে। কেননা গ্রুপের মধ্যে বয়স্ক ও যুবকদের প্রতিনিধিত্ব আছে।

৮. এককভাবে এবং গ্রুপে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে।

৯. গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহে সম্পূর্ণভাবে ৩ মাস সময় লেগেছে।

কৃষকদের জন্যে এই গবেষণা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। তারা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে সম্মিলিতভাবে তাদের এলাকায় স্থানীয় পরিবেশবান্ধব যেসব কৃষিজ সম্পদ এবং কৃষিভিত্তিক জ্ঞান আছে তার তথ্য সংগ্রহ করেছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি।

১. প্রত্যেক প্রকল্প এলাকার অর্থাৎ তিনটি উপজেলার স্থানীয় পরিবেশবান্ধব যেসব কৃষিজ সম্পদ এবং কৃষিভিত্তিক জ্ঞান আছে তার তথ্যকরণ হবে।

২. প্রকল্পে নারী-পুরুষ কৃষক সদস্যরা হাতে কলমে গবেষণা করার ক্ষমতা লাভ করবে। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ হবে।

৩. জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির বিভিন্ন দিক এবং এর প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরী হবে। কৃষকের মনে বিশ্বাস তৈরী হবে যে, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি হচ্ছে কৃষির সুস্থায়িত্বের অংশ।

এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় যে, গণগবেষণা দলের সদস্যরা তাদের এলাকার স্থানীয় পরিবেশবান্ধব যেসব কৃষিজ সম্পদ এবং কৃষিভিত্তিক জ্ঞান আছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং এসব জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তারা জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অবহিত হয়েছে। এলাকার জীববৈচিত্র্যের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞান লাভ করেছে। গণগবেষণা দলের সদস্যরা সাম্প্রতিক কৃষির সমস্যা, চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। এসব সমস্যাসমূহকে উল্লেখ করা এবং নিরসনে ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে কৃষকদের জানাবোঝা আরও গভীর ও স্পষ্ট হয়েছে।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে, জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদের অর্থাৎ পূর্বের অবস্থায় কৃষিতে এমন কিছু উপকরণ ছিল যা মানুষের জন্য উপকারী ছিল, তা পরে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব তৈরী করেছে। কৃষকরা আরও বেশি করে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে, স্থানীয় সম্পদ ও জ্ঞানের যথাযথ চর্চা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সুস্থায়ী কৃষি করা সম্ভবপর হবে।

তথ্যসূত্র

১. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯, পৃ. ৩২

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩. জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১

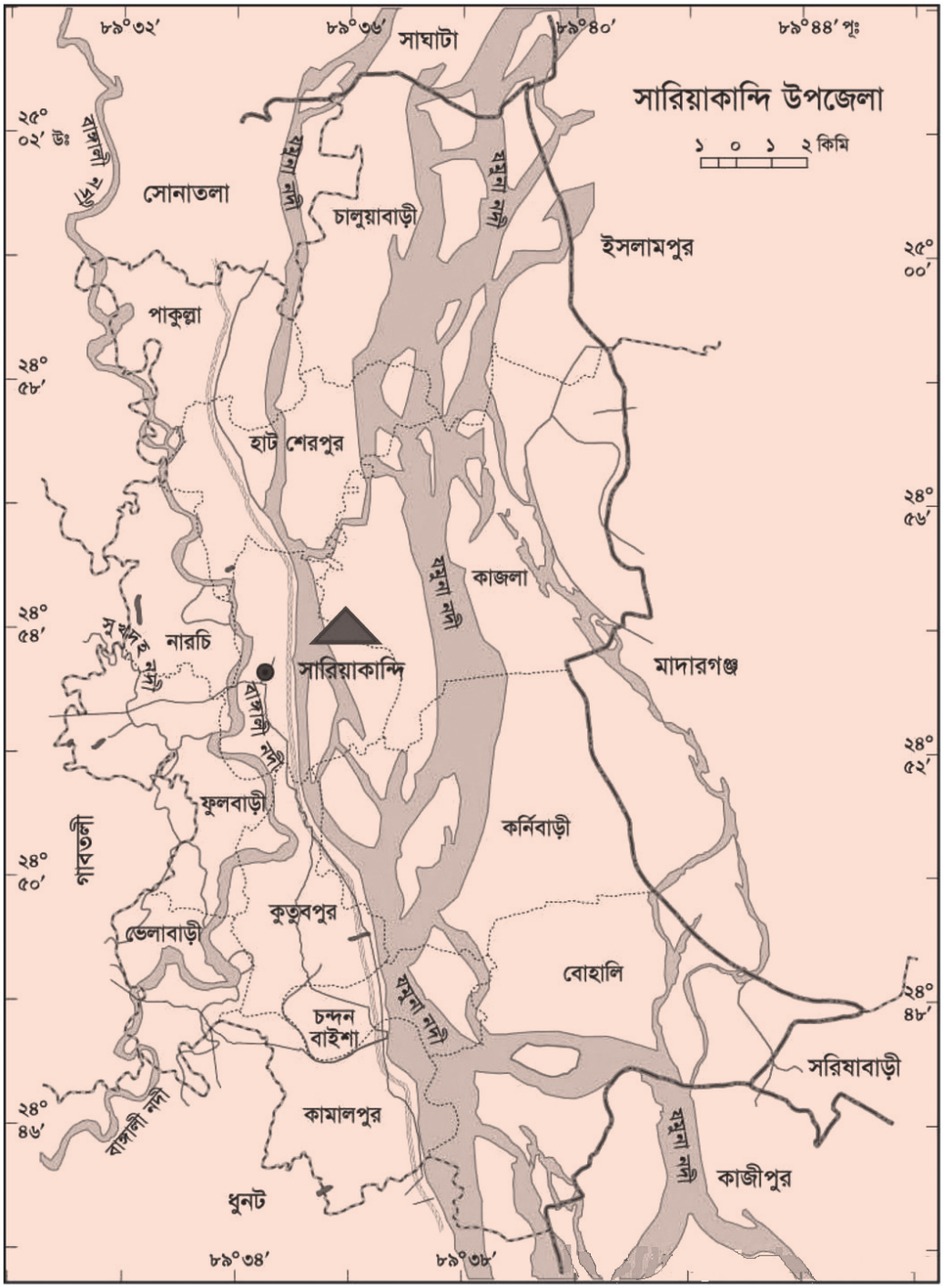
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

সুরাইয়া বেগম

প্রকল্প সমন্বয়ক

সারিয়াকান্দি উপজেলা, বগুড়া



প্রকল্প এলাকা পরিচিতি ঃ সারিয়াকান্দি উপজেলা, বগুড়া

বগুড়া জেলা শহর থেকে সোজা পূর্ব দিকে ২৩ কি:মি: দূরে অবস্থিত 'সারিয়াকান্দি উপজেলা'। সারিয়াকান্দি উপজেলা মোট ১৩টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই উপজেলার ভূ-প্রকৃতি প্রায় সমতল থেকে অসমতল পলল ভূমির ডাঙা, বিল ও চরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। উঁচু ডাঙা জমি বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয় না। নিচু ডাঙা জমি বর্ষাকালে মাঝারী ও গভীরভাবে প্লাবিত হয়। চরাঞ্চল ও নদীর খাদ এলাকা বর্ষাকালে মাঝারী থেকে গভীরভাবে প্লাবিত হয়। সারিয়াকান্দি উপজেলা পলল ভূমি ও তিস্তা পলল ভূমি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত।

সারিয়াকান্দি উপজেলার মোট ৭৩০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩৬ হেক্টর জমি বসতবাড়ি, জলাশয় ও অন্যান্য কারণে অনাবাদী এবং অবশিষ্ট ৬৯৪ হেক্টর আবাদকৃত জমির অন্তর্ভূক্ত। অনাবাদী জমির মধ্যে ডাঙা বা উঁচু জমি এবং কিছু জলাশয় রয়েছে। শতকরা ৮০ ভাগ উঁচু জমি এবং শতকরা ১৫ ভাগ মাঝারি উঁচু জমি । উঁচু জমিতে বর্ষাকালে পানি দাঁড়ায় না, তবে অতি বর্ষণের পর সাময়িকভাবে ২/৩ দিনের জন্য পানি জমে থাকে, কিন্তু এই জলাবদ্ধতা কখনো ১৫ দিনের বেশি স্থায়ী হয় না। মাঝারি উঁচু জমি বর্ষাকালে ২/৩ মাস ব্যাপী প্লাবিত থাকে এবং প্লাবনের সর্বোচ্চ গভীরতা ৯০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এ উপজেলার চাষাবাদ প্রধানত: মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জমি আবাদ করা হয়। সারিয়াকান্দি এলাকার মাটিতে পানি আটকাবার ক্ষমতা অত্যন্ত কম বিধায় পানির অপচয় অনেক বেশি এবং বোরো ধান চাষের জন্য উপযোগী নয়। পক্ষান্তরে ঐসব মাটি ইক্ষু, গম, আলু, শাক সবজি ইত্যাদি আবাদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী।

এখানকার মাটি বেলে মাটি। সারিয়াকান্দি উপজেলার ফসল পাট, গম, চীনা বাদাম, লাল ঢ্যাপা, আউশ, পেঁয়াজ, রসুন, আমন ধান। এলাকার উল্লেখযোগ্য ফসল মরিচ ও গাঞ্জিয়া ধান, যা সকলের কাছে বগুড়ার সারিয়াকান্দির একটি পরিচিতি হয়ে আছে।[১]

বালুয়ারতাইড় গ্রাম

'বালুয়ারতাইড়' গ্রামটি বগুড়া জেলা শহর থেকে পূর্ব-দক্ষিণে ২১ কি:মি: দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্বে হরিনা, পশ্চিমে দর্গতলী, উত্তরে হরিনা এবং দক্ষিনে দর্গতলী গ্রাম, যা গাবতলী উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। এই গ্রামের মাটিতে বালির ভাগ বেশি ছিল তাই গ্রামের নামকরণ বালুয়ারতাইড়। বর্তমানে বালুয়ারতাইড় গ্রামের মাটি দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ।

এই গ্রামে কৃষি জমির পরিমান ২০০ একর, গ্রামের প্রধান ফসল ধান, এছাড়া মরিচ এবং বিভিন্ন সবজি চাষ হয়ে থাকে। গ্রামে ৭০% কৃষিজীবি, ০৫% চাকুরীজীবি (দেশে) প্রবাসী ১০% দিন মজুর ১০% এবং ৫% ব্যবসায়ী।

১. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সারিয়াকান্দি উপজেলা, sariakandi.bogura.gov.bd

নয়াপাড়া গ্রাম

বগুড়া জেলা শহর থেকে পূর্ব উত্তরে ১৯ কি:মি: দূরে অবস্থিত নয়াপাড়া গ্রামের পূর্বে আমতলী, পশ্চিমে লাঠিমার ঘোল যা নেপালতরী ইউনিয়নে অবস্থিত। উত্তরে গ্রামের চিল্লির মাঠ যেখানে কৃষকরা চাষাবাদ করে এবং দক্ষিনে ফুলবাড়ি হাট। এই গ্রামের পূর্ব উত্তর দিক দিয়ে সুখদহ নদী প্রবাহিত। একদিক দিয়ে বলতে গেলে নয়াপাড়া গ্রামটি 'সুখদহ' নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামে স্থানীয় জাতের বিভিন্ন গাছ, মাছ, গৃহপালিত পশু পাখি এবং অতিথি পাখি দেখা যায়।

নয়াপাড়া গ্রামের কৃষি জমির পরিমান- ২৬০ একর। কৃষিজীবি - ৬০%, চাকুরী - ১০%, প্রবাসী - ৫%, দিনমজুর - ৫%, ব্যবসা ও অন্যান্য ২০%। গৃহপালিত পশু: গরু ৫০%, হাঁস-মুরগী ৮০%, ছাগল ২০%, ভেড়া ৫%, মাছ চাষ ৫% হয়ে থাকে। নয়াপাড়া গ্রামের প্রধান ফসল: ধান, পাট, সবজি, মরিচ। স্থানীয় জাতের ধান এবছর কৃষকরা ৬৬ শতক জমিতে করেছে। নয়াপাড়া গ্রামে মাটি দোঁ-আশ হওয়ায়, এখানকার সবজি এবং ধান চাষ ভাল হয়ে থাকে। উল্লেখ্য গণগবেষক কৃষকদের একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামের দূরত্ব: নয়াপাড়া থেকে বালুয়াতাইড়-৩ কিলোমিটার এবং নয়াপাড়া থেকে মাঝবাড়ি-৩.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মাঝবাড়ি

"মাঝবাড়ি" গ্রামটি বগুড়া জেলা শহর থেকে পূর্ব দক্ষিণে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্বে ঢেকিবাড়ি, পশ্চিমে হরিণা, উত্তরে ফুলবাড়ি এবং দক্ষিণে বৈঠাভাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি 'সুখদহ' নদীর তীরে অবস্থিত এবং নদীটি গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত। এই গ্রামে খাল বিল প্রচুর ছিল, সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। তাই গ্রামের নামকরণ হয় মাছবাড়ি থেকে মাঝবাড়ি। গ্রামের কৃষি জমির পরিমাণ ৯০০ একর, এখানকার মাটি দোঁ-আশ থেকে বেলে দোঁ-আশ। গ্রামের জনগোষ্ঠীর কৃষিজীবি ৭৫%, চাকুরী ৫%, প্রবাসী ৫%, দিনমজুর ১৫%।



বালাইনাশক তৈরী

স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ তথ্যকরণ

কৃষিজ সম্পদ

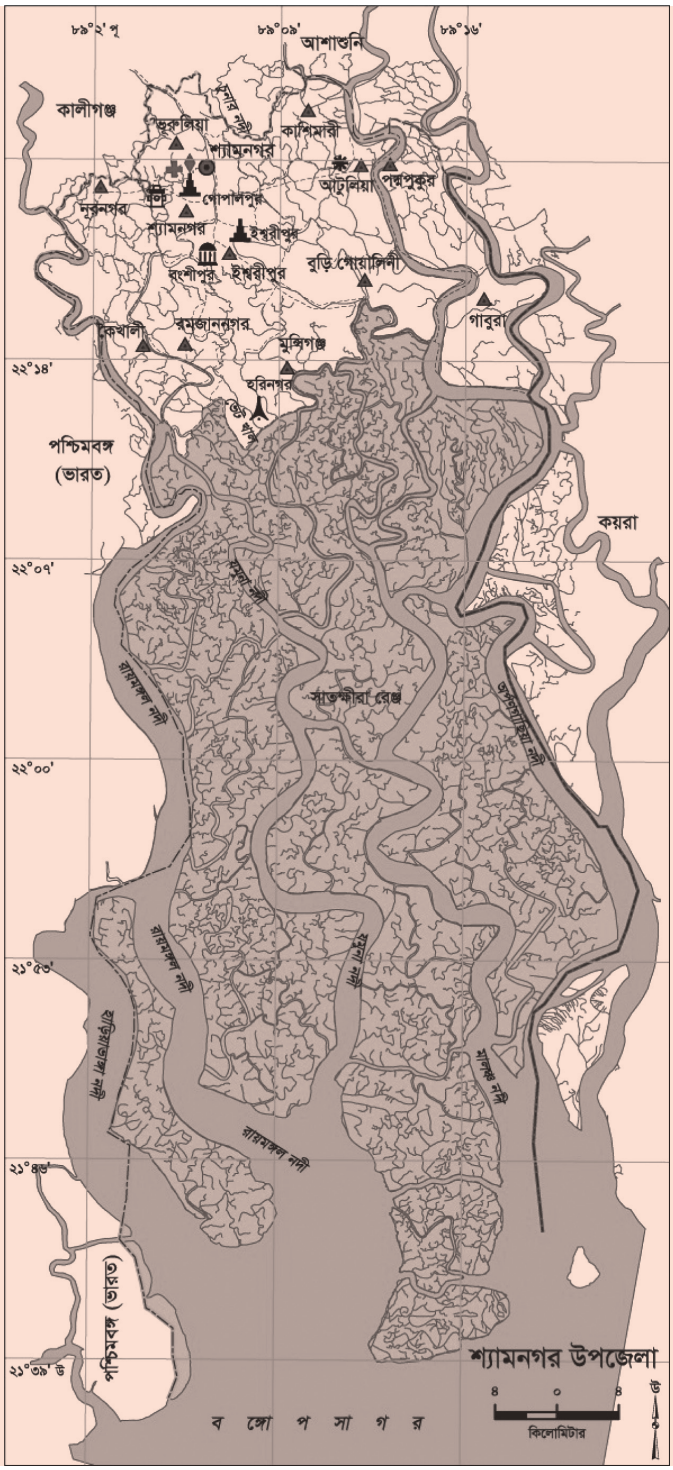
প্রাণি:	স্থলজ: গরু, ছাগল, ভেড়া, সাপ, শিয়াল, বেজি, গাওড়া, গুইসাপ । জলজ: ব্যাঙ, জোঁক, কাকড়া, মাছ, নককাটা, শামুক, ঢোড়া সাপ, ঝিনুক ।
কৃষি প্রযুক্তি	লাঙ্গল, জোয়াল, মই, কোদাল, পাচুন, লাংলে, ঈশ ।
ফসল বা বীজ	আউশ ধান: গরে, বকরি, বাওয়া, রুপি । আমন ধান: লাল ঢ্যাপা, সাদা ঢ্যাপা, নাইজামাল, আমন সাটে, পাট, বুনোধান, গম । সবজি: মূলা, লালশাক, পুঁইশাক, ডাটা, লতি, কুমড়া, চিচিঙ্গা, করলা, বরবটি, সিম । দানাদার শস্য: খেসারি, সরিষা, মশুর, মাসকালাই, বুট, কাউন, তিল, তিসি, দেওধানা, মটর । মসলা: পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ।
চাষকৃত	ধান, পাট, গম, সরিষা, তিল, তিসি, কাউন, খেসারি, খ্যারাসি, বাদাম, মরিচ, ডাটাশাক, লাউ কুমড়া, চিচিঙ্গা, করলা, বটবটি, সিম, দেওধানা, পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মুলা ।
অচাষকৃত ফসল	জগ ডুমুর, ভ্যাট, কলুম, ছাচে, পেপুর, গন্ধালি, কচু, ফ্যান, হেলেঞ্চা ।
গাছ	ঔষধি: উবুত ন্যাংরা, তুলশি, আকন্দ, ঢোলমল, কালোকেশ, বিষকাটালি,কাউন শিসা, আটিশরা, কলুম, ড্যালা ফলদ: আম, কাঁঠাল, জাম, ডেয়ো, আতা, পেয়ারা, কালোজাম, তেঁতুল, কামরাঙ্গা ফুল: জবা, শাপলা, কৃষ্ণচূড়া, জংলে জাম, কাউন শিসা, ভ্যারেন্ডা, ধুতরা, রক্ত জবা, সোনালে, শিমুল, বকুল, হিজলা, গাব, কদম, কচুরি পানা

জ্ঞান ও প্রযুক্তি

কৃষি বিষয়ক	কৃষকদের কৃষি বিষয়ে অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কৃষক কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে (পাওয়ার টিলার, ধান মাড়াই যন্ত্র, সেচ মেশিন)। কৃষকদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।
বীজ সংরক্ষণ	বীজ সংরক্ষণ বিষয়ে আগে কৃষকের ভাল জ্ঞান ছিল, তারা নিজেদের বীজ নিজেরা ঘরে রাখত, কাঁচের বোয়মে সবজি বীজ, মাটির কোলায় ধানের বীজ রাখত। এখন মূলত বাজার থেকেই বীজ কেনে। কৃষক নারীরা সেইসব শস্যের বীজ ঘরে রাখে যেসব তারা

	তাদের আঙ্গিনায় চাষ করে। ধানের বীজ সংরক্ষণে তারা কিছু প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে।
সার বিষয়ক	মাটির উর্বরতা শক্তি কমে গেছে, রাসায়নিক সার, কীটনাশক বর্তমানে ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরী হচ্ছে এবং অনেকে মাটি পরীক্ষা করছে তাদের ক্ষেত খামারের।
বালাইনাশক	আগে ফসলের বালাই ছিল কম এবং বালাইনাশক হিসাবে ছাই ব্যবহার করা হত। এখন কৃষক এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য লাভ করছে।
সেচ বিষয়ক	বৎসরে ৫ মাস বন্যার পানি থাকত, সেচ বিষয়ে কোন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছিল না, মরিচ কিংবা সবজি ফসল তারা দেশীয় প্রযুক্তি ডোঙ্গা, ছেচই দিয়ে নদী, খাল বিল জলাশয়ের পানি দিয়ে সেচ দিত। বর্তমানে সেচ যন্ত্র দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হয়। এজন্যে অনেকে স্যালোমেশিন, মর্টার ক্রয় করছে। তবে এসব পরিবেশ বান্ধব নয়।
ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ	দেশীয় প্রযুক্তিতে গরু দিয়ে (ধানের আটি গোল করে সাজিয়ে ধানের আটির উপর ৫-৬টি গরু দিয়ে ঘুরায়ে ঘুরায়ে) ফসল প্রক্রিয়াজাত করত। বর্তমানে স্যালোমেশিনের সাহায্যে ধান মাড়াই যন্ত্র দিয়ে ফসল প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। অনেক কৃষকের নিজস্ব ধান মাড়াই যন্ত্র আছে।
খাবার প্রক্রিয়াজাত করণ	দেশীয় প্রযুক্তিতে ঢেকিতে ধান ছাটা, ঘানিতে তেল মাড়াইকরা, যাতায় ডাল ছাটাই করে থাকতো। এখন সবই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়। বর্তমানে মেশিনে ধান ছাটা, তেল মাড়াই, ডাল ছাটা করে থাকে।
ঔষধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক	ঔষধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তেমন জ্ঞান ছিল না। অসুখ হলে গাছ গাছড়ার ঔষধ খাওয়াতো। এখন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতি ইউনিয়নে আছে যেখানে তারা যায়।
পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান	আগে মাছে ভাতে বাঙ্গালী ছিল বটে, পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান কম ছিল। দেশীয় মাছ, দুধ, ডিম, শাক-সবজি প্রচুর খেত। বর্তমানে পুষ্টি সম্পর্কে অনেকে জ্ঞান হয়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতনভাবে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হচ্ছে। আগে তিনবেলা ভাত খাওয়া হতো, পান্তা ভাত খাওয়া হতো। এখন দুই বেলা ভাত এবং একবেলা রুটি খাওয়া হয়। তবে অনেকে এখনও তিন বেলা ভাত খায়।

শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা



প্রকল্প এলাকা ঃ শ্যামনগর উপজেলা, সাতক্ষীরা

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে নৈসর্গিক দৃশ্যের লীলাভূমি বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর উপজেলার সৃষ্টি ১৮৯৭ সালে বৃটিশ আমলে। কথিত আছে রাজা প্রতাপাদিত্যর পুত্র উদয় আদিত্য তার রাজধানী মুঘল সৈন্যদের আক্রমন হতে রক্ষার নিমিত্তে মাটির দীর্ঘ গড় নির্মাণ করেন। উক্ত মাটির নির্মিত গড় সৈন্যদের সতর্কীকরণ গড় হিসেবে চিহ্নিত ছিল। 'সামনে গড়' কথাটি রূপান্তরিত হয়ে শ্যামনগর ধারণ করেই এ উপজেলার নাম হয়। শ্যামনগর উপজেলার উত্তরে কালিগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বিশাল বনভূমি সুন্দরবন, পূর্বে আশাশুনি উপজেলা এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলা। শ্যামনগর উপজেলার পূর্বদিকে কপোতাক্ষ ও খোলপেটুয়া নদী, পশ্চিমদিকে রায়মঙ্গল নদী। উপজেলাটি ১৯০৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট। যার মুল ভূখন্ড ৪৫৫ বর্গ কিলোমিটার এবং সুন্দরবন ১৪৪৮ বর্গ কিলোমিটার। এই উপজেলার জনগণের জীবন ধারণের উৎস কৃষিকাজ, ব্যবসা, চাকুরী, চিংড়ী চাষ, চিংড়ী রেণু সংগ্রহ, সুন্দরবন হতে কাঠ, গোলপাতা, মধু আহরণ।

গঙ্গার দুটি প্রধান শাখা পদ্মা ও ভাগিরথীর শেষ প্রান্ত কপোতাক্ষ ও ইছামতি এবং কালিন্দীর মধ্যভাগের গড়ে ওঠা জনপদের নাম শ্যামনগর। শ্যামনগর উপজেলার মধ্যে প্রবাহিত, মৃত বা প্রায় মৃত নদীগুলোর মধ্যে কালিন্দী, আদি যমুনা, ইছামতি, চুনার, মালঞ্চ, কদমতলা, আইবুড়ি, মাদার, খোলপেটুয়া, কপোতাক্ষ, মিরগাঙ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলাতে প্রচুর পরিমানে মাছ পাওয়া যায়। মাছ প্রধানতঃ দুই প্রকার পানিতে জন্মায়। মিঠা পানির মাছ ও লোনা পানির মাছ। স্থানীয় নদী-নালা, বিল-খাল, ডোবা-পুকুর ও ক্ষুদ্র জলাশয়ে এসব মাছ মেলে। শ্যামনগর উপজেলা বিশাল চাষাবাদের মাধ্যমে জমিচাষ ছাড়াও নদী এবং মৎস্য ঘের-এ মাছ চাষের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে থাকে।[১]

ধুমঘাট গ্রাম

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের ০১ নম্বর ওয়ার্ড ধুমঘাট গ্রাম উপজেলা থেকে ১২ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। তিনশত বছর পূর্বে রাজা প্রতাপাদিত্যের শাসন আমলে ধুমঘাট গ্রাম রাজধানী ছিল বলে লোক মুখে প্রচলিত আছে। তৎকালীন সময়ে রাজা ইন্ডিয়ার ঝাড়খন্ড প্রদেশ থেকে আদিবাসী মুন্ডা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে আসে যোদ্ধা হিসাবে। বর্তমান সময়ে মুন্ডা জনগোষ্ঠী ধুমঘাট গ্রামে বসবাস করে। এই গ্রামটি নিচু জায়গায় অবস্থিত এবং গ্রামে বড় বিল আছে। এই বিলে ধান এবং মাছের চাষ করা হয়। গ্রামে তুলনামূলক বড় বৃক্ষ কম। ধুমঘাট গ্রামে উঁচু জমি খুবই কম। প্রাথমিক স্কুল তিনটা, মাদ্রাসা একটা, হাইস্কুল

১. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শ্যামনগর উপজেলা, shyamnagar.satkhira.gov.bd

একটা, ঈদগা তিনটা, মসজিদ পাঁচটা, মন্দির চারটা। ধুমঘাট গ্রামের মাটি, পানি লবণাক্ত। মোট জনসংখ্যা ৩৩০০। এই গ্রামের মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামের বাইরে কাজে যায়। গ্রামের পাশ দিয়ে বংশীপুর থেকে ভেটখালী পর্যন্ত পিচের রাস্তা চলে গেছে। ভূগর্ভের পানি লবণাক্ত হওয়ায় এখানের মানুষ খাবার পানি হিসাবে বৃষ্টি ধারণ করে এবং পুকুরের পানি খেয়ে থাকে।

বংশীপুর গ্রাম

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা থেকে বংশীপুর গ্রাম ৮ কি:মি: দূরত্বে এবং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। বংশীপুর বাজার থেকে মুন্সিগঞ্জ, সুন্দরবন এবং ভেটখালী যাওয়ার রাস্তা চলে গেছে। এখানের ভূমি অফিস বংশীপুর গ্রামে অবস্থিত। তিনশত বছরের পুরানো শাহী মসজিদ সহ চারটা মসজিদ আছে এই গ্রামে। বংশীপুর গ্রামের মধ্যে একটা হাপসীখানা আছে। এর পাশে হাজারো বছরের পুরানো মা কালির মন্দির আছে। দুইটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটা কিন্ডার গার্ডেন স্কুল আছে এখানে। এই ইউনিয়নের অন্য এলাকার তুলনায় বংশীপুর গ্রাম অনেক উঁচু। গ্রামে বসবাসকারি মানুষের মধ্যে কৃষি, ব্যবসা, গাড়ী চালনা, চাকুরী এবং ইটভাটায় কাজ করা মানুষের সংখ্যাই বেশি। আবাদী ফসলের মধ্যে ধান চাষের উপরই বেশি মানুষ নির্ভরশীল এই গ্রামে। বংশীপুর বাজারে একটা ব্যাংক এবং দুইটা বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিক রয়েছে। এই গ্রামের মাটি ও পানি লবণাক্ত, বৃষ্টি বা পুকুরের পানি ফিল্টার করে খেতে হয় এখানে।

পাতড়াখোলা গ্রাম

শ্যামনগর উপজেলার রমজান নগর ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ড পাতড়াখোলা। শ্যামনগর উপজেলা হতে পাতড়াখোলা গ্রামের দূরত্ব ১০ কি:মি:। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় একটা, হাইস্কুল একটা, মাদ্রাসা দুইটা, ঈদগা দুইটা, মন্দির দুইটা, মসজিদ দুইটা, পাঞ্জেগানা তিনটা, মাটির কেল্লা একটা এবং একটা আশ্রয়কেন্দ্র আছে। বিলে বেশি ফসল হয় এবং মূলতঃ ধান চাষ করা হয়ে থাকে বিলে। আর উঁচু জমিতে সবজির আবাদ করা হয়ে থাকে। মাটি বেশিরভাগ এটেল এবং দো-আঁশ মাটি। গ্রামে হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ একসাথে বসবাস করে। পাতড়াখোলা গ্রামের পাশ দিয়ে শ্যামনগর থেকে ভেটখালী পর্যন্ত পিচের রাস্তা চলে গেছে।

স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ তথ্যকরণ

কৃষিজ সম্পদ

প্রাণি

স্থলজ: দেশী বিদেশী গরু, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, হাঁস, মুরগী কবুতর আছে। ধুমঘাট গ্রামের মধ্যে ৬টা পরিবারে ৩৪ টা মহিষ আছে। গ্রামের মধ্যে খাটাশ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল নানান প্রকার পাখি, ইঁদুর, বাদুড় কম পরিমাণ আছে। গরুর মধ্যে এখন দেশী গরুর পাশাপাশি সিন্ধী, গির, ফ্রিজিয়ান গরুর লালন পালন করা হয় বেশী মাংস ও দুধের জন্যে। তবে কৃষক স্বীকার করে যে, দেশী গরুর অসুখ কম হয়, মাংস স্বাদযুক্ত এবং দুধের স্বাদ বেশি।

জলজ: দেশী মাছ খুবই কম আছে। অনেক দেশী জাতের মাছ পাওয়া যায় না, যেমন নয়না মাছ, দেশি কইমাছ, টেংরা ও বেলে মাছ। বিদেশী কার্প জাতীয় মাছ বেশি চাষ হচ্ছে। বাগদা চিংড়ি, পারশে, থাই কই, বিদেশী মাগুর, পাঙ্গাস, মনো সেক্স তেলাপিয়া চাষ করা হচ্ছে। রাসায়নিক সার বিষ ব্যবহারের ফলে দেশী প্রজাতির অচাষকৃত মাছ, জলজ পোকা মাকড়, সাপ মারা যাচ্ছে ও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি এবং পুষ্টিযুক্ত খাবারের অভাব হয়ে যাচ্ছে । জীববৈচিত্র্য আর থাকছে না।

চাষকৃত ফসল

ধান সবজির বীজ এখন প্রধানত হাইব্রীড বা উচ্চ ফলনশীল জাত। এই জাতের বীজগুলো বাড়িতে রেখে ভাল ফসল পাওয়া যায় না। এই কারণে কৃষক বাড়িতে আর বীজ রাখে না। প্রতিবারের ন্যায় অধিক মূল্য দিয়ে কোম্পানীর বীজ বাজার থেকে কিনতে হয়। এলাকার বীজ সম্পদ মূলত: কোম্পানীর বীজের উপর নির্ভর হয়ে গেছে।

অচাষকৃত ফসল

অচাষকৃত ফসলকে আগাছা বলা হয় এবং এসব উদ্ভিদ ঘাস মারা বিষ দিয়ে মারা হয়, বারবার রাসায়নিক সার বিষ ব্যবহার করার ফলে অচাষকৃত ফসলের বীজ বা বংশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কুড়িয়ে পাওয়া শাক-সবজি কম খাওয়া হয়। এর ফলে ফসলে ক্ষতিকর পোকামাকড় বেশি আক্রমণ করছে, মাটির জৈব শক্তি কমে যাচ্ছে।

ঔষধি, ফুল, ফলদ ও অন্যান্য:

গাছ

দেশি গাছের পরিবর্তে বিদেশী সকল প্রকার গাছ লাগানোর জন্য সবাই আগ্রহী, ফলে নেপিয়ার ঘাস, ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি এবং ইপিল ইপিল গাছ উল্লেখযোগ্যভাবে এলাকায় লাগানো হয়। ওষধি গাছ থাকছে না, হাইব্রীড এইসব উচ্চ ফলনশীল গাছ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পরিবেশ এর ক্ষতি বাড়ছে। দেশি গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে।

জ্ঞান ও প্রযুক্তি

কৃষি বিষয়ক	কৃষক এর কৃষি বিষয়ক জ্ঞান অন্যের কাছ থেকে ধার করা। কৃষি প্রযুক্তি গুলো বিদেশী। তাই ফসলের কোন সমস্যা হলে অন্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই কৃষকের পরনির্ভরশীলতা বেড়েছে। তার জন্য কৃষকের অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। কৃষি বিষয়ক জ্ঞান সঠিকভাবে না থাকায় কৃষি কাজ করে কৃষককে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।
বীজ সংরক্ষণ	বীজ কৃষক রাখে না এখন। নিত্য নতুন বীজ বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে। বীজ সংরক্ষণ করে কোম্পানীরা। কৃষক বীজ কেনে অধিক দাম দিয়ে এবং বীজ সংরক্ষণ করার কাজটা বাড়তি ঝামেলা মনে করে। কোম্পানীর হাতে জিম্মি হয়ে গেছে কৃষকরা।
সার বিষয়ক	সার মানে রাসায়নিক সার, ইউরিয়া, ফসফেট, জিপসাম, পটাশ, সালফার, দস্তা, জিং ইত্যাদি। কৃষকরা বেশি রাসায়নিক সার দিচ্ছে ফলে মাটির জীব অণুজীব ধ্বংস হয়ে গেছে। মাটির উর্বরা শক্তি কম হয়ে যাচ্ছে। গণগবেষণা দলের সদস্যরা জৈব সার তৈরী করে মাটিতে ব্যবহার করছে।
বালাই নাশক	রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করা হয় বালাইনাশক হিসাবে, আর সেটা বিদেশী। ফলে ফসল উৎপাদন বিষ যুক্ত হচ্ছে। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে অধিক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। অর্থ সাশ্রয়ী হয়ে থাকে জৈব সার ব্যবহারের ফলে, তাছাড়া পরিবেশ ভাল থাকে। গণগবেষক সদস্যরা জৈব বালাইনাশক তৈরী করে ফসলে ব্যবহার করছে।
ঔষধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান	শারীরিকভাবে অসুস্থ্য হলে ডাক্তারের কাছে যায় চিকিৎসার জন্য অথবা ঔষধ এর দোকান থেকে রোগ বর্ণনা করে ঔষধ নেয়। তার জন্য চিকিৎসা খাতে কৃষকের বেশী খরচ হচ্ছে। কৃষকেরা স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন এখন, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই এখন অসুস্থ্য। ডাক্তার, ক্লিনিক, হাসপাতাল দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুরারোগ্য রোগ যেমন, ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, কিডনী নষ্ট হয়ে যাওয়া, লিভার সিরোসিস ইত্যাদি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য বিষয় সচেতন থাকার পরও রাসায়নিক সার আর বিষযুক্ত খাদ্য খাওয়ার কারণে রোগাক্রান্ত হচ্ছে।
পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান	এখন সকল খাদ্য খাবার ভেজাল। মানুষ এখন ফাস্টফুড-এ আসক্ত হচ্ছে, চিপস, ঠান্ডা পানীয়, চকোলেট, কোক এসবে আসক্ত হচ্ছে। কিন্তু তাতে পুষ্টি আছে কিনা সেই জ্ঞান কম। মানুষ বুঝতেই চায় না, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যেই মানুষের আগ্রহ বেশি, সেটাতে পুষ্টি থাক আর নাই থাক। মাছ, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী মোটাতাজা করণে রাসায়নিক খাদ্য খাইয়ে দ্রুত টাকা রোজগারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। তার ফলে মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এর পাশাপাশি খাদ্য বিষযুক্ত হচ্ছে।

সেচ ব্যবস্থা	ভূ-গর্ভ থেকে স্যালো মেশিন, মটর, ডিপ পাম্প দিয়ে সেচ দেওয়া হয় এখন। পুকুর, খাল, বিল থেকে স্যালো মেশিন দিয়ে, পলিথিন ফিতা পাইপ দিয়ে সেচ দেওয়া হয়, আবার মাটিতে ড্রেন করে সেচ দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষকের অর্থ খরচ হচ্ছে, কিন্তু শ্রম ও সময় কম ব্যয় করতে হচ্ছে। আগে পুকুরের পানি ব্যবহার করে সেচ দেওয়া হতো। তাতে কায়িক পরিশ্রম হতো। যা কৃষকের স্বাস্থ্য ভালো রাখত। শরীরে প্রাণশক্তি বেশি ছিল। এখন তা বেশি দেখা যায় না।
ফসল প্রক্রিয়াজাত করণ	ধান ঝাড়া হয় মেশিনে, সেই ধান সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। কৃষক নিজের বাড়িতে ফসল প্রক্রিয়াজাত করে খুবই কম।
খাবার (প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী)	এখনকার উৎপাদনকৃত ফসল বেশি দিন রেখে খাওয়া যায় না, নষ্ট হয়ে যায়। চালের বস্তার মধ্যে গ্যাস টেবলেট দিয়ে রাখে। ফ্রিজে রেখে খাবার সংরক্ষণের প্রবণতা বেড়েছে। এখন খাবার স্বাদ আর পুষ্টি কম। ফলমূল আগে দেশীয় ফল খাওয়া হতো। অনেক ফল এখন পাওয়া যায় না কারণ সেইসব গাছ আর লাগানো হয় না, এর বদলে কিছু আমদানী করা ফলমূলের চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে মাল্টা, স্ট্রবেরী, ড্রাগন ফল, বারোমাসী আম উল্লেখযোগ্য।



কৃষকরা বাওফার সার তৈরি করছে

নীলফামারী সদর উপজেলা, নীলফামারী



প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী সদর উপজেলা, নীলফামারী

নীলফামারী সদর উপজেলা ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় । রংপুর গেজেটিয়ার হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায় ১৮৭৫ সালে সদর থানা বর্তমান উপজেলার ১৩ নং চড়াইখোলা ইউনিয়নের অন্তর্গত দারোয়ানী মৌজায় প্রথম স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মধ্যে নীলফামারীতে নীল চাষের উপযোগিতা বিবেচনায় এই উপজেলার নটখানা এলাকায় প্রচুর নীলের চাষাবাদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নীলের খামার স্থাপিত হয় । বর্তমান নীলফামারী রেল ষ্টেশনের অদুরে একটি বিরাট নীলের খামার লোকজ কণ্ঠে 'নীল খামার' থেকে 'নীলফামারী' নামের উৎপত্তি হয় । ১৮৫৯ - ১৮৬০ সালে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের ফলে অত্র অঞ্চলে নীল চাষের যবনিকাপাত ঘটলেও কালের চাকায় 'নীলফামারী' নাম ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে ।

নীলফামারী সদর উপজেলার উপর দিয়ে তিস্তা, বুড়িতিস্তা, ইছামতি, চাড়াল কাটা, সর্বমঙ্গলা, সালকী, চিকলি, দেওনাই সহ অনেক নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে । এ গুলির মধ্যে প্রধান নদীগুলো উৎপন্ন হয়েছে হিমালয় এবং আসামের পার্বত্য এলাকা থেকে । প্রধান নদীর শাখা নদীগুলো জালের মতো বিছিয়ে আছে নীলফামারীর বুকে । নীলফামারী সদর উপজেলার উল্লেখযোগ্য বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম - নীলফামারী বড় বাজার, মাধার মোড় কাঁচা বাজার, চৌরঙ্গী বাজার, পৌর বাজার ও পাচমাথা কাঁচাবাজার ।

সীমান্তবর্তী জেলা হওয়া সত্বেও দেশের অন্যান্য উপজেলার তুলনায় নীলফামারী সদর উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভাল । সড়ক ও রেলপথে রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহর রাজশাহীর সাথে নীলফামারী সদরের যোগাযোগ আছে । ঢাকা থেকে সড়ক পথে নীলফামারী সদরের দূরত্ব ৩৯৪ কি.মি. । নীলফামারী জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভাল । জেলা শহর থেকে প্রত্যেকটি উপজেলায় এবং উপজেলার সাথে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে পাকা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান । সৈয়দপুর উপজেলায় রেলওয়ের কারখানা আছে বৃটিশ আমল থেকে । সড়ক পথে জেলা শহর হতে সৈয়দপুর উপজেলার দূরত্ব ২২ কিলোমিটার[১] ।

সোনারায় ইউনিয়ন

নীলফামারী সদর উপজেলার ১১ নং সোনারায় ইউনিয়ন হচ্ছে নীলফামারী শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে, একটি কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা । এখানে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয়, তবে তিন ফসলি জমিও আছে । তাই শাক সবজি চাষাবাদ হয় এখানে বেশি । এই ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী ৪০,০৭৯ জন, শিক্ষার হার ৬৩.৪৬% । এখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মসজিদ, মন্দির, খোয়াড়, শশ্মাণ ঘাট, পূজা মন্ডপ এবং হাটবাজার আছে । ঐতিহাসিক স্থান বলতে ১১০ বছরের একটি পুরাতন মন্দির রয়েছে । দুইটি

১. বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, নীলফামারী উপজেলা, nilphamarisadar.nilphamari.gov.bd

রেলওয়ে স্টেশন আছে, যা বাংলাদেশের আর কোথাও নজির নেই যেমন: দারোয়ানী রেলওয়ে স্টেশন ও কয়রাতনগর রেলওয়ে স্টেশন। নীলফামারী সদরে অন্য ১৫ টি ইউনিয়নের মধ্যে ধান, শাক-সবজি ও অশস্য চাষ বেশি করা হয়। ব্রিটিশ আমলে সোনাবাবু নামে এক ব্যাক্তির নামেই এই ইউনিয়নের নামকরণ করা হয়। এই ইউনিয়নের তিনটি গ্রাম - বেড়াকুঠি, সরকারপাড়া ও জয়চন্ডীতে রিইব ২০১৭ সাল থেকে কাজ করছে। এই ইউনিয়নের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। নিকট দূরত্বে আছে ইপিজেড। যেখানে বিদেশী কোম্পানীগুলোতে পরচুলা বানানোর কারখানা আছে এবং এসব কারখানাতে শ্রমিক হিসাবে বেশিরভাগ গ্রামের নারী পুরুষ কাজ করে।

বেড়াকুঠি, সরকারপাড়া ও জয়চন্ডী গ্রাম

বেড়াকুঠি গ্রাম: ব্রিটিশ আমলে যখন নীলফামারীতে নীলচাষ হত, তখন বৃটিশ সাহেবরা এই কুঠীতে এসে থাকতো এবং দেখাশুনা করত। এই কুঠিটি বাঁশের বেঁড়া দিয়ে ঘেরা ছিল, তখন থেকেই এটার নামকরণ করা হয় বেড়াকুঠি। বেড়াকুঠি গ্রাম হচ্ছে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। এই গ্রামে ধান এবং বিভিন্ন শাকসবজি বেশি চাষাবাদ করা হয় এবং বিভিন্ন অশস্য উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এই গ্রামের পুরুষ দিনমজুরের পাশাপাশি নারীরা এখানে দিনমজুরের কাজ করে। গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। পুরুষ মহিলা উভয়ই কৃষি কাজের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত। গ্রামে দুটি বড় পুকুর আছে। শাপলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি হাইস্কুল ও দুটি প্রাইমারী স্কুল আছে। ইউনিয়নের বড় হাট বড়ুয়াহাট পাশেই অবস্থিত।

সরকারপাড়া গ্রাম: বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এখানে ধন মামুন নামে একজন জমির দলিল লেখক ছিল। তারই নামে নামকরণ করা হয় সরকারপাড়া গ্রাম। তিস্তা ক্যানেল তীরবর্তী এই গ্রামে ধান ও শাকসবজি প্রচুর চাষাবাদ করা হয় এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অশস্য উদ্ভিদ দেখা যায়। সেচ কাজে তিস্তার পানি ব্যবহার করে কৃষকরা। সরকারপাড়ায় বসবাসকারী মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। পুরুষ ও নারী উভয় কৃষি পেশার সাথে জড়িত। পুরুষ ও নারী উভয় এখানে দিনমজুরের কাজ করে। এখানে প্রচুর বাঁশ ঝাড় রয়েছে।

জয়চন্ডি গ্রাম: ব্রিটিশ আমলে হিন্দু প্রভাবশালীরা এখানে বসবাস করত এবং তারা চন্ডির পূজা করত এবং সেখানে পাঠা বলি দিত। আর সেই পাঠা বলি দেওয়া হত 'জয় মা চন্ডি' বলে এবং "জয় চন্ডির জয়" বলে আওয়াজ তুলতো। তখন থেকেই এটার নামকরণ হয় জয়চন্ডি। জয়চন্ডি গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এখানে ধান, শাক-সবজি চাষাবাদ হয়। পাশাপাশি অশস্য উদ্ভিদ দেখা যায় এবং পাওয়া যায়। এখানেও পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই কৃষি কাজের সাথে জড়িত। এই গ্রামটিতে জীববৈচিত্র্য কম পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৫-২০ বিঘার মত জমির মালিক কৃষক এখানে বসবাস করে। অন্যদিকে পুরুষ ও নারী উভয় এখানে দিনমজুরের কাজ করে।

স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষিজ সম্পদ তথ্যকরণ

কৃষিজ সম্পদ

প্রাণি

স্থলজ ঃ গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি
জলজ ঃ মাছ, সাপ, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক, কাকড়া, কুচিয়া

ফসল

চাষকৃত ফসল ঃ ধান, গম, পাট, নাপা শাক, বাবো শাক, পালং, ধনেপাতা, পুইশাক, লাউ, শিম, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, কায়তা, ঘেরা, শসা, তরাই, সাতপুতি, ঝিংগা, কাউন, পয়রা, আলু, আদা, হলুদ, পিয়াজ, রসুন, মরিচ, বেগুন, মুখিকচু, করলা, মিষ্টি আলু, তামাক, মসুর ডাল, খেসারি ডাল, ঠাকুরি ডাল, টাউরি কালাই, মটর কালাই, পটল ।
অচাষকৃত ফসল ঃ ঢেঁকি শাক, কচুর ডেরা, কচুর পাতা, জোংগাইর ডেরা, মাঝ আলু, তেপতা আলু, রসুন শাক, মানকচু, আনাডি, দিবা কচু, ডিমালি শাক, মানিমনি শাক, হেলেঞ্চা শাক, ছানছিরি শাক, আমরুল শাক, কলমি শাক, টেপরাই শাক, বাটি শাক, কানশিকা শাক, চাম ঘাস, বথুয়া শাক, সাদা কচু, কালা কচু, বিষমানা কচু ।

গাছ

ঔষধি গাছ ঃ বিষকাটালি গাছ, শ্বেত পাপড়ি, কালো কিসিরি, মানিমুনি মোটা, সরু, বনভাদাই, হাতিসুরা, উলট কম্বল, রক্ত হেলা, ছয়বুড়ি, লজ্জাবতী, ভাটিগাছ, বাইরালি, আটশ্বর, হারবকসা, আকন্দের গাছ, ভারুয়া হলদি, এন্ডা, একবির, বিষ ঢেকিয়া, কেওয়া, কামনি ফুল, কানসিকা গাছ, কেল্লাবই, আঠিয়া কলার শিকড়, অফলা শিমুলের শেকড়, ভুই কুমড়া, খেজুর গাছের শিকড়, আইস্টা, রসুন শাক, নাকনতি, ঢেঁকিয়া শাক, বস, ভুই তিতা, কুকুর মতা, রক্ত জবা, পেপল, শুনটিয়া ।

ফলদ গাছ ঃ আম, কাঠাল, জাম, লিচু, পানিয়াল, নটকো, বেল, গোলাপ জাম, কাউয়া ঠুটি, ডালিম, খেজুর, তাল সুপারি, কাঠ লিচু, তেতুল, ডুমুর, আমড়া, জলপাই, ডাউয়া, নারিকেল, আতা, পেয়ারা, চাকগুয়া, জাম্বুরা, বড়ই, কলা, চিনি চম্পা কলা, আঠিয়া কলা, মালভোগ কলা, কাচা কলা, ছাছি কলা, পেপে, আমলকি, হরতকি, বহেরা, সপেদা, লেবু, জামরুল ।
ফুল ঃ কড়িয়া ফুল, শাপলা ফুল, মৌয়া ফুল

জ্ঞান ও প্রযুক্তি

কৃষি বিষয়ক জ্ঞান

কৃষি বিষয়ে বিশেষভাবে কিভাবে আবাদ করবে, কোন কোন উপকরণ কিভাবে জমিতে দিবে, কখন গোবর ছাই ইত্যাদি দিতে হয় কৃষক জানত । যেমন, লাঙ্গল, হাল, মই ইত্যাদি কৃষকের নিজের ঘরে ছিল, নিজে ব্যবহার করত । জমিতে চাষ দিতো, হাল চাষের জ্ঞান ছিল, বীজ রাখার জ্ঞান ছিল, কোন ফসল কোন জমিতে ভাল হবে, ফসলের চেহারা দেখে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতো । কোন জমির বীজ নিলে বীজ ভাল হবে, যা

পরবর্তীতে লাগানো যাবে। কোন ফসল কোন সময়ে লাগাতে হবে– এসব জ্ঞান কৃষকের ছিল এবং এখনও আছে।

বীজ সংরক্ষণ

ধানের বীজ প্রথমে পিড়ায় মাড়াই করে ২/৩ টা ডাং দিয়ে যে ধানটা পড়বে সেই ধান বীজগুলো রোদে শুকিয়ে মাটির হাড়িতে কাদা করে প্রলেপ করে রাখা হতো। আলু বীজ ঘরের মধ্যে, খড়ের ঘরের মধ্যে, ছাদে রাখা হতো। খড়ের মধ্যে আলু রেখে বেঁধে পুড়া করে রাখা হতো, পাড়ং এর ঘরে বালু দিয়ে খুটার নিচে ফসল রাখা হতো। বিভিন্ন শাক সবজি বীজ, কাঁচের বোতলে মাটির হাড়িতে, কাপড়ে বেঁধে রাখা হতো। ৪-৫ মাস পর পর রোদে শুকিয়ে বীজগুলো রাখা হতো। ঘেরা সহ লাউয়ের খোলে বীজ রাখা হতো।

খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী)

আগে ভাত রান্না করে খাবার পর বাকী ভাতগুলো মাটির কাটুয়াতে রেখে মাটির প্লেট দিয়ে ঢেকে রাখা হতো, তাতে ভাত নষ্ট হয় না। তরকারিও এইভাবে রাখা হয়। সেই ভাত, তরকারী সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত থাকে। ভাত, তরকারি আগে মাটির হাড়িতে রান্না করা হতো এখন এলুমিনিয়াম-এর হাড়ি ব্যবহার করা হয়। এখন গ্রামে বিদ্যুৎ আছে সুতরাং অনেক বাড়িতে ফ্রিজ আছে খাবার সংরক্ষণের জন্য।

ঔষধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান

জ্বর আসলে জাম্বুরা অথবা আনারস এই ফলগুলো দিয়ে সরিষার তেল, লবণ মিশ্রণ করে খেলে এবং বিভিন্ন ঔষুধি গাছের রস করে খেলে জ্বর কমে যায়। হাত, পা মচকে গেলে লবণ কেরোসিন তেল গরম করে সেই জায়গায় মালিশ করে দিলে ব্যাথা দূর হয়। আকন্দের পাতা ও বালু গরম করে শেক দিলে বাত ব্যথা কমে যায়।

কাচা টমেটো ভিটামিন সি, কালা কচু, কচুর পাতা, পেলকা খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়, চোখের দৃষ্টি ভাল হয়। পেপের তরকারী ও কাঁচা কলা রান্না করে খেলে শরীরের ভিতর ঠান্ডা থাকে।

সার বিষয়ক

বাড়ির গোবর গর্ত থেকে তুলে মাটিতে শুকিয়ে ঝুরঝুর করে জমিতে দেয়া হতো এবং বাড়ির আবর্জনা ছাই ভিড়ায় পালা করে রেখে জমিতে দেয়া হতো, গরুর গাড়িতে ফাড় বসিয়ে গোবর, বাড়ির আবর্জনা ইত্যাদি এবং জমির আবর্জনা বা ঘাস পচে জৈব সার তৈরি হতো। মাটি উর্বর হয়েছে কিনা বোঝা যায় যে, হাত দিয়ে ধরলে মাটি গলে যায়, কেঁচো বেশি দেখা দেয়। জমিতে সাপ, ব্যাঙ, শামুক-ঝিনুক ছিল, জমি দেখে বুঝা যেত জমির মাটি ভাল।

বালাইনাশক বিষয়ক

আগে কোন পোকামাকড় ছিল না, কোন পচানী রোগ ছিল না, তাই কোন স্প্রে করার দরকার হয় নাই।

সেচ বিষয়ক

আগে জমিতে বেশি পানি দিতে হয় নাই, যদি পানি দেয়া হতো তাহলে পদ্ধতি ছিল– মাটিয়া চুয়া, ঢেঁকিকল, ভার ভাঙঘুয়া দিয়ে পানি দেয়া হতো, সেউতি দিয়ে পুকুর থেকে পানি তোলা হতো।

ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ

আগে ভাত খাওয়ার জন্য ও ধান বিক্রির জন্য, ধান মাচায় রাখা হত। সরু ধান কালানানিয়া, সাদা নানিয়া এগুলো ধান বাশের ডুলিতে খৈ খাওয়ার জন্য রাখা হত। নলিধান রাখা হত বাশের ডুলিতে খৈ খাওয়ার জন্য। পাট পাড়ং এর বাঁশের ঘরে, গম চটের বস্তায় এবং ধান ও গম কাঠের পিড়ায় মাড়াই করা হত। পাট পচিয়ে এবং পাট ডাংগিয়ে ধোয়া হত। শাক সবজি হাত দিয়ে তুলে এনে, রোদ দিয়ে বীজ রাখা হতো। আগে যে কোন ফসল চটের বস্তা, হাড়ি, মাচায় রাখা হতো।

উপসংহার

গ্রামাঞ্চলে কৃষি পরিবেশবান্ধব জ্ঞান সম্পদ

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে। একই সাথে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন নীতিও প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের জন্যে এখন প্রশিক্ষণ পরিচালনা হয়ে থাকে বিভিন্ন এলাকায়। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকেও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যেসব প্রশিক্ষণে এই তিন এলাকার কৃষকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। রিইব জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষি বিষয়ে প্রকল্পের শুরু থেকেই আলোচনা, স্কুল ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। যা স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক জ্ঞানকে প্রসারিত করেছে একথা বলা যায়। কেননা এসব জ্ঞানের চর্চা এখন এলাকায় হচ্ছে। রিইব-এর এসব স্কুলে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, গবেষক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেছেন। এসব জ্ঞান কৃষককে সমৃদ্ধ করেছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে এসব জ্ঞানকে সম্পদে পরিণত করতে সহায়তা করছে।

কৃষক জানে কেন জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি করা প্রয়োজন। এর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির প্রয়োগ ছোট ছোট গৃহস্থালীর জন্য কার্যকর, যেখানে জৈব ইনপুট সহযোগে উৎপাদন সম্ভব হতে পারে, যা কিনা স্থানীয়ভাবে প্রমাণিত। স্থানীয় চর্চাসমূহের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যকর মাটি ব্যবস্থাপনা, কম্পোস্ট সার, মাটিতে অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্থানীয় পানির প্রবাহ এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পরাগায়নকারী পতঙ্গের নিরাপত্তা এবং বন্ধু পোকাসমূহকে পরিচিতকরণ (যেমন ঃ মাকড়সা, ডেয়ো পিঁপড়ে ইত্যাদি), পশু-পাখি (শামুক, মাছ, পাখি) এবং পরিবেশ ও আকাশকে পরিষ্কার রাখা, বাতাস নিরাপদ রাখা বিভিন্ন উদ্ভিদের মাধ্যমে। এটা প্রকৃতপক্ষে, কৃষি খামারগুলোর জৈবিকভাবে পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে, যা পরবর্তীতে অগ্রণী ভূমিকা রেখে থাকে কৃষি প্রতিবেশ প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি হিসেবে। যেখানে আছে উর্বরতার পুনরাবর্তন, জৈব বস্তুর একীভূতকরণ, জৈব কীটনাশকের নিয়মবদ্ধকরণ ইত্যাদি এবং স্থানীয় সম্পদ ও শ্রমের কার্যকর ব্যবহার। এছাড়া জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি পদ্ধতি একটি বিকল্প পথের প্রস্তাব দেয়, কৃষি নিয়ে স্পষ্ট জানা বোঝার জন্য এবং যা বিশেষ পরিবেশ উপযোগী ও প্রয়োগযোগ্য। এই ধারণা খামার ব্যবস্থায় জৈব নীতি ও সম্পদের সমসাময়িক বোঝাপড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।

একটি সুস্থায়ী কৃষির উদ্দেশ্য হিসেবে জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি পরিবেশগত প্রক্রিয়াসমূহকে প্রতিষ্ঠিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থারসাথে সংযুক্ত করে । জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির উদ্দেশ্য টেকনোলজি এবং ইনপুট নির্ভর কৃষির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা নয়, বরং এর বদলে নিরূপণ করে কীভাবে এবং কখন তা প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবিক সম্পদের সাথে মিলেমিশে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিবেশগত (ইকোলজিক্যাল) নীতিসমূহ আনয়ন করে এগ্রো ইকো-সিস্টেম বা বিকল্প কৃষি পদ্ধতি। যা একটি নতুন ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরামর্শ দেয়,

যা অন্য কোথাও বিবেচনা যোগ্য ছিল না। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ এর সুফলের জন্য কম ইনপুট ব্যবহার করে কিভাবে নিরাপদ খাদ্য আরও বেশি উৎপাদন করা যায়। প্রকল্প এলাকার কৃষকরা জানে যে, রাসায়নিক কৃষি প্রচলনের আগে যে কৃষি ছিল তা প্রাচীন এবং প্রকৃতি নির্ভর, জীববৈচিত্র্য নির্ভর। যা এই এলাকার জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খেয়ে টিকে আছে। এটাই ছিল মূলধারার কৃষি। পরবর্তীতে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমানের কৃষিব্যবস্থা মূলতঃ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানীর দখলে। যারা চাষাবাদের যন্ত্র, বীজ ও কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ করে। এই জ্ঞান কৃষকদের কাছে সাম্প্রতিককালে পৌছেছে। এখন তারা জানে যে বিকল্প কৃষি ব্যবস্থা আছে যা কিনা জীববৈচিত্র্যনির্ভর। যেখানে শস্যের বীজ কৃষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে, স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা যায়। তাদের মধ্যে এই জ্ঞান সঞ্চারিত হয়েছে যে, এলাকার পানির প্রাপ্যতা অনুসারে চাষাবাদ করা দরকার। বিশেষ করে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে চাষ করাই প্রকৃতিকে নিরাপদ রাখে। শুধু প্রকৃতিকেই নয়, মানব স্বাস্থ্যের জন্যও জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি জরুরী। সে কারণে তারা এই ধরনের বিকল্প চাষে আগ্রহী হয়েছে এবং হাতে কলমে চাষ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান যাচাই করে নেবার চেষ্টা করছে। একই সাথে বিকল্প কৃষি পদ্ধতি তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে যে, কোন পদ্ধতি সে নিজে প্রয়োগ করবে? যদিও বিষয়টি এত সরল নয়, এখানে অনেক হিসাব নিকাশ করতে হয়। কিন্তু তারপরও কৃষকের সামনে বিকল্প পথ রয়েছে, তার বেছে নেবার স্বাধীনতা রয়েছে।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা কৃষিকাজে জমি চাষ, পোকা দমন, সার প্রয়োগের মত বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ হতে জ্ঞান আহরণ করেছে এসব বিষয়ে এবং তা বন্টন করেছে এলাকার অন্যান্য কৃষকদের মাঝে স্থানীয় স্কুল, নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ, কৃষিমেলা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে। যেখানে তারা নিম্নোক্ত বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের সাথে আলোচনা করেছেন। যা তারা প্রাপ্ত হয়েছিলেন রিইব আয়োজিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও কর্মশালার মাধ্যমে। তাদের জ্ঞান সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছিল নিম্নোক্ত তথ্য লাভের কারণে। এখানে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল।

১. জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষি ঃ

এখন কৃষকরা জানে যে, জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষি কী এবং এর আবশ্যক উপাদান কি। কৃষি ইকোসিস্টেম এবং এর গাঠনিক জটিলতা, কৃষি ইকোসিস্টেমের সমৃদ্ধতা বৃদ্ধির উপায়। মাটি সংরক্ষণ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহার, শস্য বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলবার বিভিন্ন পদ্ধতি। যেমন অন্তর্বর্তী শস্য চাষ, চক্রাবর্তী চাষ, পর্যায়ক্রমে বিবিধ শস্যের চাষ, শস্যের জাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং বহুতলীয় মিশ্র চাষ ইত্যাদি। কৃষকরা আরও জানে যে, কীভাবে অ-শস্য সঙ্গী উদ্ভিদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা যায়। শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ, শস্যের শত্রু পোকা দমনে কী করণীয়। শস্যের রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং শস্যে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা যায় কীভাবে।

২. ফসলের শত্রু পোকা দমন ও রোগবালাই সম্পর্কে জ্ঞান ঃ

ফসলে শত্রু পোকার আক্রমণ একটি সাধারণ সমস্যা। রাসায়নিক কৃষিকাজে দেখা যায় যে, কৃষক সরাসরি কৃষি উপকরণ বিক্রয় করে এমন দোকানে গিয়ে ওষুধ কিনে এনে স্প্রে করে পোকা দমন করে। এক্ষেত্রে কৃষকের নিজস্ব কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, অর্থ থাকলেই হয়। কিন্তু পরিবেশ বান্ধব কৃষিতে প্রয়োজন জ্ঞানসম্পদ। এখানে জানতে হয় যে, জাবপোকার শরীরের উপর কাদা গলিয়ে ছিটিয়ে দিলে পোকা নড়াচড়া না করতে পেরে মারা যায়। এছাড়াও কেরোসিনের সাথে ছাই মিশিয়ে গাছের গোড়ায় ছিটানো হলে পোকার আক্রমণ কমে।

অনেক সময় রোগাক্রান্ত পাতা কেটে ফেললে বা পানি ছিটালে আক্রমণ কমে; কিংবা অশস্য উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চাষাবাদ করলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কম হয়, আবার নাবী ধ্বসা রোগাক্রান্ত টমেটো গাছে বোর্দো মিকশ্চার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় । অনেক সময় রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিলেও রোগ-বালাই কম হয় । কোন কোন ফসলে আলোর ফাঁদ ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় । কৃষক এখন জানে যে, ফসল চক্র অনুসরণ করে চাষাবাদ করলে পোকা তখন কোন পোষক পাবে না, ফলে বংশবিস্তার করতে পারবে না ।

৩. জৈব বালাইনাশক সম্পর্কিত জ্ঞান

জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির অন্যতম দিক জৈব বালাইনাশক সম্পর্কিত জ্ঞান । ফসল উৎপাদনের সঙ্গে পোকামাকড় ও বালাই এর উপস্থিতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এক্ষেত্রে প্রচুর রাসায়নিক বালাইনাশক বাজারে সুলভ । কিন্তু তার প্রয়োগের ফলে উপকারী পোকা যেমন ধ্বংস হচ্ছে তেমনি নতুন নতুন অনেক পোকামাকড় ও বালাই এর উদ্ভব হচ্ছে । সাধারণত ফসলের ক্ষেতে শত্রু পোকার চেয়ে বন্ধু পোকার সংখ্যা বেশি । ফসলের ক্ষেতের ইকোসিস্টেম বজায় রাখার জন্য এসব পোকামাকড়ের উপস্থিতি জরুরী । অন্যদিকে ফসলের ক্ষেতে বিভিন্ন রোগবালাই হয় । যা কৃষকের জন্যে দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি করছেন এমন কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন বালাইনাশক সম্পর্কে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেসবের চর্চাও হচ্ছে । কৃষক এখন জানে যে, রসুন ও তামাকের পাতার মত তীব্র গন্ধ রয়েছে এমন পাতা পোকা-মাকড় সহ্য করতে পারে না, তারা ক্ষেত ছেড়ে চলে যায় । মরিচ, কেরোসিন ইত্যাদি পোকা নিধনে কাজ করে । বিভিন্ন গাছ গাছড়ার তেল, নিম তেল, সরিষার তেল, তুলা বীজের তেল পোকা মারতে কাজ করে । বিভিন্ন বীজ, পাতা যেমন মেহগনি ফলের বীজ, নিম পাতা, জাম পাতা পোকা ও রোগ দমনে সহায়ক । কৃষকদের কাছে খুব পরিচিত, যা তারা অনেক আগে থেকেই বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করছে এমন কিছু গাছগাছড়া উল্লেখযোগ্য । যেমন তুলসী পাতা, গাঁদা ফুল গাছ, বিষ কাটালী পাতা, ঢোল কলমী পাতা, সজিনা পাতা ইত্যাদি । অন্যদিকে দাঁত মাজার গুল, সাবান জলের পানি, হলুদ মরিচের গুড়া জাতীয় দ্রব্যও বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করে কৃষকরা । এমনকি গো-চোনাও বিভিন্ন পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দমনে বিশেষভাবে কার্যকরী । কেমিকেল পদার্থ হিসাবে চুন ও তুঁতে সহযোগে বর্দ্দো মিকশ্চারও জীববৈচিত্র্যনির্ভর কৃষির বালাইনাশক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ।

৪. অণুজীব সার ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর একটি সংগঠন বাংলাদেশ অর্গানিক এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক । যারা জৈব কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করছে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা, নিরাপদ খাবার, সুস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে । উক্ত সংগঠনটি মূলতঃ জৈব বালাইনাশক, সার এবং মাটির অণুজীব রক্ষায় জ্ঞান উৎপাদন করছে । বিশেষ করে দেশীয় অণুজীব বা ইনডিজেনাস মাইক্রো অর্গানিজম সংক্ষেপে যাকে IMO বলা হয় তা নিয়ে কাজ করছে । রিইব প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষ কৃষকদের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) নিয়ে গিয়ে IMO সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেছিল । যা কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে এবং এই বিষয়ে তারা স্ব-উদ্যোগে প্রতি এলাকায় তৈরি করেছে IMO-১, IMO-৩ এর মত অণুজীব সার । ফসলের ক্ষেতে এসব প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন অণুজীব প্রদান করে তারা ভালো ফলাফল লাভ করেছে । কারণ এসব অণুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, একটিনোমাইসিটিস ইত্যাদি মাটির স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদকে রোগবালাই

থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় এটি বিশেষভাবে কাজ করে, কেননা মাটিতে যেসব অণুজীব বাস করে তাদের কাজ হলো গাছকে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা ও ক্ষতিকর অণুজীব থেকে রক্ষা করা। IMO মাটির জন্য উপকারী এমন অণুজীব তৈরি করে। গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা এসব জ্ঞান আহরণ করে তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্য কৃষকদের মাঝে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কৃষি কর্মকর্তাদের মাঝে প্রচার করে থাকে।

একইভাবে কেঁচো কম্পোস্ট সার, বাওফার অর্থাৎ Biologically Active Organic Farming (BAOFAR) বা অণুজীব সার, ভার্মি ওয়াশ বা কেঁচো ধোয়া তরল সার তৈরি ও এর প্রয়োগ সম্পর্কেও কৃষকদের মধ্যে জানা বোঝা স্পষ্ট হয়েছে।

৫. অন্যান্য জ্ঞান ঃ

প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত না হলেও কিছু কিছু এলাকায় ধানের সংকরায়ন, এসআরআই পদ্ধতিতে ধান চাষ নিয়ে কাজ হচ্ছে। বীজ শোধন, অশস্য উদ্ভিদ বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ, হাজলের মাধ্যমে মুরগীর বাচ্চা ফুটানো, পাখির আবাস তৈরির জন্য বড় গাছে কলস বাঁধা, পোকা নিধনে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহকার করা, সম্পর্কিত জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। কৃষকদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েও সচেতনতা তৈরি হচ্ছে। এ সম্পর্কিত পরিবেশবান্ধব বিষয়গুলো কৃষকদের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সর্বোপরি কৃষকদের মধ্যে এই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটেছে যে, তারা এখন রাসায়নিক কৃষি ও জীববৈচিত্র্যনির্ভর স্থায়ী কৃষির মধ্যেকার পার্থক্যগুলো অনুধাবন করতে পারছে। আশা করা যায় জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, প্রকৃতি, ইকোসিস্টেম, কৃষি ও জীবন জীবিকা নিয়ে কৃষক ক্রমশঃ আরও অধিক জ্ঞান চর্চা ও কাজের মাধ্যমে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রেখে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যেকার গণগবেষণা চর্চা ও বাস্তবতায় তার প্রয়োগ সুস্থায়ী কৃষির প্রসারে গভীর ভূমিকা রাখবে।



হাজল



Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.



Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in